নভেলেটের আধারে ইতিহাস চেতনা : অমিয়ভূষণ মজুমদার

অপর্ণা পাল

মধ্যযুগের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে নানা অবাস্তব ঘটনা সমন্বিত কল্পমূলক কাহিনি 'রোমান্স' নামে প্রচলিত ছিল। মধ্যযুগীয় প্রাচীর ভেঙে রেনেসাঁস প্রদীপ্ত ইয়োরোপে 'নভেল' নামে একটি বিষয় পরিচিত হতে থাকে। ফরাসি ভাষায় শব্দটি নুভেল (Nouvella), ইতালি নভেলা (Novella) বা স্পেনীয় নভেলা (novela) ফ্রান্সে চতুর্দশ শতকে লেখা বোকাচ্চিওর 'ডেকামেরন' - এর একাধিক ছোটোগল্প বোঝাতে 'নুভেলা' শব্দটি প্রথম ব্যবহৃত হয়। আদিরূপে 'নভেলা' -এবং 'রোমান্স' -এর মধ্যে মিল লক্ষ করা গেলেও ক্রমশ রেনেসাঁস উত্তর যুগে 'নভেল' ও 'রোমান্স' - এর বৈলক্ষণ সুস্পষ্ট। নভেল সম্পর্কে বলা হল—

> It referred to fictitious prose narrative with characters or actions represention everyday life (sometimes in the past but more often in the present - hence 'New', a matter of Novelty, a novella)' and as such it stood in contrast to the traditional 'romance'[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীতে 'রোমান্স' - এর অলৌকিক গল্পগাথা ক্রমশ গুরুত্ব হারিয়েছে এব মানুষের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনসম্মত রূপকর্ম 'নভেল' তার বিস্তার ও প্রসিদ্ধিলাভ করেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে ইয়োরোপে আরেকটি সাহিত্য রূপকর্ম প্রাধান্য লাভ করতে থাকে। বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় প্রকাশের ভিতর দিয়ে আধুনিক সাহিত্যের এই নতুন রূপটির লক্ষণ ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যার নামকরণ হয় 'শর্ট স্টোরি'। গল্প তো চিরকালই মানুষের মুখে মুখে বিভিন্নভাবে প্রচলিত ছিল। উদাহরণরূপে বলা যায় বাইবেল -এর নিউ টেস্টামেন্ট - এর অংশ মধ্যযুগীয় ফ্রান্স - এর ফেবুলাস বা সপ্তদশ শতাব্দীর চিন-এর পিং হুর লেখাগুলি। তাহলে আধুনিক রূপকর্ম রূপে 'শট' স্টোরি' বলতে কী বোঝায়? ওই একই প্রবন্ধে একটি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন পূর্বোক্ত সমালোচক। 'what a story is : a recital of events. But what constitutes an event? How many events go to make up a minimal story? 'শর্ট স্টোরি' বা বাংলায় 'ছোটোগল্প' শুধুমাত্র নানা ঘটনার গ্রন্থন বললে বিবিধ প্রশ্ন ভিড় করে আসে। 'ইভেন্ট' (Event) ঘটনা 'শট' স্টোরি' রচনার সাংগঠিক মৌলিক একক হলেও প্রায় সমস্ত সমালোচকই স্বীকার করে নিয়েছেন 'পোয়েটিক্স' -এ সপ্তম অধ্যায়ে কথিত প্লট বা কাহিনি সংগঠনের কথা। 'that a plot must have beginning middle and end in order to be a whole. And the same aesthetic Pattern is evinced in that incremental trebling of actions which recurs in so many durably appealing tales.'[২] যদিও বর্তমানের সুররিয়ালিস্টক ভাবনায় প্লট সম্পর্কিত প্রথাসিদ্ধ পারম্পর্যটি লক্ষিত হচ্ছে না। 'শর্ট স্টোরি' এই মূল রূপকর্মটির নানা বৈচিত্র্য সাধিত হচ্ছে। তথাপি মূল গঠনে প্লট-এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

এখন প্রশ্ন হল 'শট' স্টোরি'র 'শর্ট -এর পরিধির পরিমাপ কী? পাঁচশো শব্দে লেখা গল্পও ছোটোগল্প আবার কখনো কখনো ছোটোগল্পের শব্দসীমা বত্রিশ হাজারও অতিক্রম করে গেলে তাকে কী ছোটোগল্প বলা যায়? ছোটোগল্প সম্পর্কিত গাণিতিক পরিসংখ্যান আমাদের সামনে সাহিত্যের এই বিশেষ রূপকর্মটির একটি প্রাথমিক ধারণা তৈরিতে সাহায্য করে। কিন্তু ছোটোগল্পের প্রকৃত চরিত্র লক্ষণ বিধৃত থাকে এ অন্তর্নিহিত ধর্মে। ছোটোগল্প হল চলমান অভিজ্ঞতার খণ্ড ঘটনা বিশেষ বা অনুভূতি থেকে জাত জীবনের সামগ্রিক প্রতীতি বা বোধ। এখানে লক্ষ থাকে একমুখীনতা ঘটনা কাহিনি এখানে কেন্দ্রাভিমুখী। আর উপন্যাস হল জীবনের বিস্তার। এখান্যে জীবনের সামগ্রিক রূপকর্মটি ধরা পড়ে, তবে তা আরও বিস্তৃতভাবে। ঘটনা, কাহিনি, চরিত্রের ব্যাখ্যায়, বিশ্লেষণের ভিতর দিয়ে ঔপন্যাসিক একটি সামগ্রিক জীবন দর্শন বোধে উন্নীত হন।

ছোটোগল্প এবং নভেল বা উপন্যাস ছাড়াও আরও একটি কাহিনিভিত্তিক রূপশিল্প শিল্পীরা নির্মান করে থাকেন যার নাম বলা যায় নভেলেট সম্পর্কে বিভিন্ন অভিধানে যে সংজ্ঞা পাওয়া যায়—

১. Novelette- A work of fiction intermediate in length or complexity between a short story and novel.[৩]

২. British- A light, usually sentimental romantic Novel.

ক্যাসেলস এনসাইক্লোপিডিয়া লিটারেচারও প্রায় এক ধরনের লঘু ধারণাত্মক সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে—

> Novelette- a short novel, usually now meaning a sentimental or thrilling story, cheaply produced and sold, of negligible letaray merit. However the word may also have the non - pejorative meaning, especially in the united states, of a long short story, intermediate in length between the short story and the 'NOVELLA.'.[৪]

উদ্ধৃত সংজ্ঞাগুলিতে নভেলেটের প্রকৃত ভাবগত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েনি। দৈর্ঘ্যে এবং জটিলতায় ছোটোগল্প এবং উপন্যাসের মাঝামাঝি বললে এর প্রকৃত চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয় না এবং নভেলেট সম্পর্কে সে এক ধরনের লঘুতামূলক ভাববেগ বা ভয় উদ্রেগকারী গল্প যা সহজেই লেখা যায় এমন ধারণা সাহিত্যিক এই রূপকর্মটির প্রতি অবহেলা করা হয় প্রদর্শন করে। বরং বিভিন্ন সাহিত্যিকের লেখা নভেলেট শ্রেণির রচনা থেকে এর যে রূপগত এ ভাবগত চরিত্র নির্ধারণ করতে পারি তা হল—নভেলেট আকারে সাধারণত ছোটোগল্প অপেক্ষা বড়ো এবং উপন্যাস অপেক্ষা ছোটো হবে। কিন্তু 'নভেলেট' -এ 'নভেল' হয়ে ওঠার সমস্ত উপাদান বর্তমান থাকে। চরিত্র ঘটনার ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, রচয়িতার জীবন দর্শন প্রভৃতি সবই থাকে কিন্তু সংহত আকারে। এতে কম্‌প্যাক্ট (compact) বা ঘনবন্ধ কম্‌প্রেস বা সংহতভাবে বিদ্যমান থাকে উপন্যাসের সম্ভাবনা। এখানে উপন্যাসের ভাষাগত পরিসরের চেয়ে ব্যঞ্জনাগত পরিসর অনেক বেশি। রবীন্দ্রনাথের নভেলেট দুইবোন, মালঞ্চ। শরৎচন্দ্রের এই শ্রেণির রচনা — বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি। অমিয়ভূষণ মজুমদার স্বাধীনতা উত্তর বাংলা ঔপন্যাসিকদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট নাম। তাঁর রচনা বৈচিত্র্য এবং আঙ্গিক - শৈলি বাংলা উপন্যাসের একটি স্বতন্ত্র স্বাদ এবং ভঙ্গির উপস্থাপনা করেছে। তাঁর দুটি

বিশিষ্ট নভেলেট মধু সাধু খাঁ এবং মহিষকুড়ার উপকথা — উপন্যাস হয়ে ওঠার সমস্ত সম্ভাবনা নিয়ে দুই শ্রেণির ভিন্নধর্মী ইতিহাসবোধ এবং স্বতন্ত্র জীবন রসের সৃষ্টি করেছে পরিমিত পরিসরে, ব্যঞ্জনাধর্মী ভাষা এবং রূপাঙ্কন ক্ষমতার দক্ষতায়।

মধু সাধু খাঁ বাংলার ষোড়শ শতাব্দীর বণিক কাহিনি। মধুর পদবি সাধু হলেও সে কোনো যোগী পুরুষ নয়। বরং সে বজরায় জলপথে যাত্রার মধ্যে দিয়ে বিকিকিনি করে চলে সাউকারি পণ্য। তাই সাধুর ছেলে সে সাহা বা সাউ। এ থেকে বোঝা যায় সাউকার বা সাহা পদবীর সঙ্গে বণিকদের একটি সম্পর্ক আছে। মধু সাধু খাঁ নামক এই বণিক প্রতিনিধির মধ্যে দিয়ে লেখক বাংলার বণিক সমাজ এবং মধ্যবিত্ত সমাজের একটি বিশ্বস্ততার চিত্র অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বস্তুত আলোচিত উপন্যাসটি একদিকে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার এক চিত্রপটের নির্মাণ। যখন বাংলার বণিক নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিল তার বাণিজ্যে। উপন্যাসটির অন্যতম প্রধান গুণ তার ভাস্কর্যধর্ম। সীমিত পরিসরের স্বল্প আয়তনে মধুর দৈহিক চিত্র, চরিত্র, তার জলযান প্রভৃতির প্রত্যক্ষবৎ নির্মাণ সেই সময়ের সমাজ, জীবনযাত্রাকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন।

> মাথার উপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল মধু। সেখানে সময়। তাই বলে তার ভুল হবে এমনত হয় না। স্রোতে কাঠি গাড়া যায় না বটে আজ কিন্তু রবিবার, তিসরা সপ্তাহ, মাস জ্যৈষ্ঠ, তা নদী দেখলেই বুঝবে, পন্দরশো আট শক। সময়কে স্রোতে কাঠি গাড়া যেন। এ নদী সে নদী করে উজিয়ে চলেছে বলে সময়ের দিক ভুল হবে কেন?[৫]

এই কয়েকটি ছত্রে, আমরা পেয়ে যাচ্ছি শকাব্দে নির্দিষ্ট বৎসর, মাস, সপ্তাহ ও দিন— এর মধ্যে দিয়ে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের এক বিত্তবান বাঙালি মননে সজীব হয়ে ধরা দেয়।

উপন্যাসটি শুরু হয়েছে বজরার উপর। বণিক মধু এবং মাঝি, মাল্লা, পাচক, দাস সকলেই বজরায় আসীন। এছাড়াও আছে এক ব্যক্তি। সে ফিরিঙ্গি। মধু সা নাম দিয়েছে বলাই। সে ঠিক কোন ইয়োরোপীয় দেশের মানুষ তা স্পষ্টভাবে না উল্লেখ থাকলেও লেখক লিখেছেন—

> বুঝতে পারছি ঘটনাটা ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের। এবং আমার দৃঢ় প্রত্যয় ফিরিঙ্গি বলাই সেই ইংরেজ পর্যটক রালফ্ ফিচ্ নিজেই। ইতিহাসের চরিত্রই বটে।[৬]

ইতিহাসও এই তথ্যের সমর্থন করে। লন্ডন নিবাসী এই বণিকের জন্ম হয়েছিল ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দে। প্রথম যে ব্রিটিশরা ভারতে ও দক্ষিণ এশিয়াতে আসেন তিনি ছিলেন তাদেরই একজন। তিনি গোয়াতে বন্দি হয়েছিলেন পোর্তুগিজদের হাতে। পরে মুক্তি পেয়ে চলে যান সিরিয়া। সিরিয়া থেকে ১৫৮৪-তে আসেন ভারতে। তিনি আকবরের রাজসভায় গিয়েছিলেন। কোচবিহার অঞ্চলে ছিলেন। যমুনা, গঙ্গা তীর ধরে প্রায়শই তিনি নৌকায় বারাণসী ও পাটনা হয়ে বাংলায় আসেন। পূর্ব বাংলা হয়ে রালফ ফিচ তৎকালীন ব্রহ্মদেশে গিয়েছিলেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে রেঙ্গুন হয়ে তিনি ১৫৮৮ তে মালয়ে যান বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১৫৯১ খ্রিস্টাব্দে রালফ ফিচ দেশে ফিরে যান। তাঁর ভ্রমণ কাহিনির চাক্ষুষ প্রতিবেদন পরবর্তীকালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম আগত ব্যক্তিদের কাছে খুবই মূল্যবান ছিল। পূর্ববঙ্গ হয়ে কামতাপুরী ব্রহ্মদেশের উদ্দেশে মধুর যে বাণিজ্যযাত্রা তার ফিরিঙ্গি সঙ্গী রালফ ফিচ হওয়ার যথেষ্ট ইতিহাসসম্মত কারণ আছে।

উপন্যাসে মধু সা-র পরিচয় —'মধু সা এক বেনে। নিবাস পূর্বস্থলী, জাতে কায়েৎ। এবং সাতপুরুষে বেনে' এবং মধু সা-র খুড়োও বণিক ছিলেন।

বোঝা যায় বাণিজ্য এদের ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক জীবিকা। এবং—

> এই নাও মধু সা'র পৈতৃক। লম্বাই ত্রিশ হাতের আঙুল দু চার কম, চওড়া দু হাতের উপরে এক বিঘৎ। উদ্ভট গড়ন, খাড়াইও কম। এদিকে ছয় ওদিকে ছয়—বারো দাঁড় যখন একসঙ্গে পড়ে তখন টালমাটাল করে, কিন্তু তখন স্রোত ছুঁয়ে উড়ে চলে যেন। এতে বাণিজ্য করতো মধুর পিতাও।[৭]

বংশানুক্রমিক এই বণিক সম্প্রদায়কে অবলম্বন করে লেখক বজরা, তার বাণিজ্যপসরা, তার অনুচরদের জীবনযাত্রা, জলযাত্রার কাহিনি তথা বণিক বাংলার ইতিহাসের ছবি শিল্পের আঙিনায় রূপায়িত করেছেন। বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলিতে বণিক অভিযানে এমন টুকরো টুকরো ইতিহাস স্থান পেয়ে যায়। মঙ্গলকাব্যের এই বণিক নায়করা অমিয়ভূষণকে আকর্ষণ করেছে বিভিন্নভাবেই। যেমন : চাঁদ সদাগরকে অবলম্বন করে রচিত তাঁর বিস্তৃত উপন্যাস চাঁদবেনে (১৯৯৩)।

বিভিন্ন স্থান থেকে পণ্য নিয়ে স্বদেশে বিক্রি করে এবং স্বদেশজাত পণ্য বিভিন্ন অঞ্চলে বিক্রি করাই হল বণিকের কাজ। আর এই বিনিময় প্রক্রিয়ার অন্তরাল দিয়েই বণিকের সম্পদ বাড়তে থাকে। মধুর পণ্য কী কী?

> আর পণ্য? পণ্য এখন কিছু বদলেছে এই দশ বছরে, অর্থাৎ পিতার মৃত্যুর পর থেকে। দক্ষিণ থেকে সে আনে চুয়াচন্দন, এলাইচি, লবঙ্গ, শান্তিপুরী শাঁখের চুড়ি উত্তর থেকে নিয়ে যায় কস্তুরী আর পোস্তদানা, যষ্টিমধু, এন্ডি আর ভোট - কম্বল, কখনও সন্তরা আর আমলকী। কিন্তু কতটুকুই বা তার এ নৌকা বইতে পারে। এ তো আর লাদাই করার গাদা বোট নয়। কখনও শখনও পিছে পিছে তেমন এক দ্বিতীয় না থাকে বটে। কিন্তু তা হলেই কী, মধুর গেঁজে সোনার চাকতিতে ভরে ওঠে।[৮]

ইতিহাসবিদের রচনা থেকে তৎকালীন বাণিজ্য - পণ্যের যে বিবরণ পাওয়া যায় তার সঙ্গে অমিয়ভূষণের বর্ণনার কিছু মিল পাওয়া যায়, কিছু পাওয়া যায় না। যেমন—

> Bengal was the richest country in the world for cotton, Ginger, Sugar, Grain and flash of every kind.[৯]

কিংবা—

> এদেশে সমুদ্রতীরে ও অভ্যন্তরভাগে বহু নগরী আছে। ভিতরের নগরগুলিতে হিন্দু মুসলমান দুই-ই আছে— ইহারা জাহাজে করিয়া বাণিজ্য দ্রব্য বহু দেশে পাঠায় এই দেশের প্রধান বন্দরের নাম 'বেঙ্গল' (Bengal)। আরব, পারস্য,

আবিসিনিয়া ও ভারতবাসী বহু বণিক এই নগরে বাস করে। এদেশের বড় বড় বণিকদের বড় বড় জাহাজ আছে এবং ইহা নানা দ্রব্যে বোঝাই করিয়া তাহারা করমণ্ডল উপকূল, মালাবার, ক্যাম্বে, পেগু, টেনাসেরিম, সুমাত্রা, লঙ্কা এবং মলাক্কায় যায়। এদেশে বহু পরিমাণ তুলা, ইক্ষু, উৎকৃষ্ট আদা ও মরিচ হয়। এখানে নানা রকমের সূক্ষ্ম বস্তর তৈরি হয়, এবং আরবেও পারস্যে ইহা দ্বারা এত অধিক পরিমাণে টুপি তৈরী করে যে প্রতি বৎসর অনেক জাহাজ বোঝাই করিয়া এই কাপড়ের চালান দেয়। এছাড়া ফল এবং পশু পাখিও আছে।[১০]

আমরা অমিয়ভূষণের রচনায় চিনি, শস্যদানা, পশুপাখি অপেক্ষা সুগন্ধি মশলা, ফল, মধুর উল্লেখ পাচ্ছি বেশি।

মধুর বজরায় ফিরিঙ্গি ছাড়া আরও একজন চরিত্রকে নাম ভূমিকায় এবং বিবিধ কর্মে উপস্থিত হতে দেখছি। তার নাম বদর। ফর্সা রং, টানা চোখ, উন্নত নাক দেখে বোঝা যায় তার শরীরে ইরানি রক্ত আছে। চার বছর ধরে সে মধুর বাণিজ্য যাত্রার সঙ্গী। সে মধুর ব্যক্তিগত সেবা করে। তামাক পানীয় এগিয়ে দেয়। চন্দন কাঠ গুছিয়ে দেয়— এসবই তার কাজ। কিন্তু চার বছর ধরে মধুর সেবা করার পরেও বদরের প্রতি তার কোনো মানবিক ভালোবাসা জন্মায়নি। বিকিকিনির নৌকা টেনে কামতাপুরের রাজার এলাকায় ধামায় পণ্য সাজিয়ে ভেট দিয়ে আসতে হয়েছিল বদরকে শুল্ক। সুতরাং বাণিজ্যপণ্য হিসেবে দাস কেনাবেচার যে উল্লেখ পাই ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল আমলে অমিয়ভূষণের রচনায় তার কোনে ঐতিহাসিক ব্যত্যয় ঘটেনি।

উপন্যাসটিতে মধুর বাণিজ্য যাত্রা পথের মানচিত্রও খুব স্পষ্টভাবে অঙ্কিত। পূর্বস্থলী অর্থাৎ গঙ্গাতীরবর্তী নবদ্বীপ - শান্তিপুর অঞ্চল থেকে মধু জলপথে একমাস ধরে যাত্রা উত্তরপূর্ব দিকে—

ধুবুড়িকে ডাইনে ফেলে দক্ষিণে এসেছিল তারা। এমন ধল্লা বেয়ে কামতাপুরের দিকে চলেছে তারা ভাগীরথী, ভৈরব, পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র'র পরে এমন ধল্লা। পূর্বস্থলী থেকে কামতা। দক্ষিণ থেকে উত্তর।[১১]

নবদ্বীপ অঞ্চলবাসী বণিক যে বাণিজ্য যাত্রায় চলেছে উত্তর - পূর্বদিকে তার সমর্থন আমরা অন্য রচনা থেকেও পাই— নবদ্বীপ পূর্ব ও উত্তর - পূর্ববঙ্গের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের কেন্দ্র ছিল। চাটিগাঁ, সিলেট, প্রভৃতি স্থান থেকে ধনী ও সংস্কৃতিমান ব্যক্তিদের অনেকে উঠে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন।[১২]

বণিকদের বাণিজ্যের প্রধান অবলম্বন নৌকা। এই নৌকাও যে কত রকমের এবং তার যে কত সুন্দর নাম তার ইঙ্গিত পাওয়া যায় অমিয়ভূষণের রচনাতে। সরু লিকলিকে নৌকা যার নাম কোষা, কিংবা বাজরা যার দুই তোপ আছে। আছে ছোটো ডিঙি, বড়ো মাড় নৌকা। পাঁচশোমনী লম্বা নৌকা যাতে করে যুদ্ধ করা যায়। সুকুমার সেন মধ্যযুগের বাংলা ও বাঙালী গ্রন্থে বাংলার সমৃদ্ধময় বাণিজ্যিক যুগের নানান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এবং গলুই বিশিষ্ট নৌকার চিত্রবিচিত্র উদাহরণ দিয়েছেন। যেমন দৈর্ঘ্য হিসাবে বিশহাতি, বাইশ, পঁচিশা কিংবা গলুই হিসেবে 'সিংহমুখী', 'ব্যাঘ্রমুখী', 'হংসমুখী', 'নাগমানী', 'শঙ্খচূড়' প্রভৃতি।

জলপথে বাণিজ্যযাত্রার ইতিহাস শুধু বিচিত্র জীবন ও প্রকৃতির রঙে বর্ণময় নয়। জলপথের নৌচালনার নিজস্ব কিছু বিপদ আছে। ডাঙা আর জল পৃথক রক। অন্ধকারে জল চিনতে অসুবিধা। জলের গভীরতা বোঝা যায় না। কিংবা বাতাস লাগছে পালে। জল সব জায়গায় সমান গভীর নয়। এবং দুটি নদীর শেষ যেখানে সে দু-মোহানা পার হওয়া খুব বিপজ্জনক কাজ। দিনের বেলাতেই চলে উঠে পড়ার ভয় থাকে আর কখনো কখনো রাতেও এই দুই মোহনা অতিক্রম করতে হয়। এছাড়াও াছে নদীর অথই জলরে মাঝে ঝড়ের বুকে নিজেদের রক্ষা করা। উপন্যাস মধ্যে এরকম এক হঠাৎ-ই তারাভরা আকাশের অপর কোণে চেয়ে আশঙ্কিত হয় মধুর পৈতৃক কালের দক্ষ পাটনি গন্না ঘোষ ওরফে গগন ঘোষ। এ সময় সে যেন শুধু হাত দিয়ে নয়, সারা শরীর দিয়ে হাল চেপে ধরে।

নৌকা তখন তলিয়ে গিয়েছে যেন পাটতনে এছা স্রোত, শুধু শক্ত পাল তাকে আকাশে ঝুলিয়ে আটকে রাখছে। ঝড় তেড়ে তেড়ে গজরে - গজরে মুখে ফেনার গাঁজ তুলে - তুলে ছুটে আসে।[১৩]

জলপথে দ্বিতীয় যে প্রধান বিপদটির সম্মুখীন হতে হয় তা হলে জলদস্যুদের আক্রমণ। ধল্লাতে এমনই এক আক্রমণের সঙ্গে ঝোঝাপড়া করেছে মধু।

ধল্লা জুড়ে নৌকা আর নৌকা। যেন ঝাঁকবাধা। আসল ঝাঁক সামনে।...বুকের ভিতর ধক করে উঠল, আর তারপরও ধুকপুক করছে। গলা শুকিয়ে উঠল যেন। এ যেন সেই দৃশ্যই।...ভাসান - দেয় কুমিরের মত নৌকার সার।...দুখানা নৌকা পাশাপাশি উপরে বাঁশের মাচায় বাঁধা। তার উপরে গায়ে - গায়ে লাগা ঘোড়া। পাঁচশোমনী লম্বা নৌকা, দাড়িওলা উঁচু - উঁচু পাঠান তাতে। মাঝে মাঝে তোপদার কোষা, টেঁটা ভাল্লা হাতে মাল্লার সারি তার উপের।[১৪]

এইভাবে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার বাণিজ্যিক জীবনযাত্রার খানিক ইতিহাসের সত্যতা নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মধু সাধু খাঁ নভেলেটে।

মধু সাধু খাঁ শুধু তৎকালীন নৌ-যাত্রার ছবিই লিপিবদ্ধ করে না। বণিক শ্রেণির ব্যক্তিগত জীবন, তথা পারিবারিক জীবন। তৎকালীন সামাজিক রীতি-নীতি খাদ্যাভ্যাস, বেশভূষা, আচার সংস্কার সহ তথা জীবনচর্চার সামগ্রিক রূপ ও পরিস্ফুট হয়েছে আলোচিত রচনায়।

পূর্বস্থলীবাসী কায়স্থ বণিকের পিতার তিন স্ত্রী। কনিষ্ঠ পত্নী স্বামীর মৃত্যুতে সতী হয়েছিলেন। তিনি পত্নীর মধ্যে একজন সহমরণে যাওয়ার ঘটনায় বোঝা যায় সতীদাহের প্রচলন ছিল, কিন্তু বাধ্যতামূলক ছিল না। মধু পিতার একমাত্র পুত্র। ভগ্নীরা বিহারিত। তার কাকাও ছিল বণিক। পুরুষানুক্রমে তারা ব্যবসায়ী। কাকার স্ত্রী ছাড়াও ছিল বিবিসাহেব নামে কথিত এক রক্ষিতা। কাকার মৃত্যুর পর কাকার স্ত্রীর মতো এই রক্ষিতাকেও মধু সম্মানে তার পরিবারে স্থান দিয়েছে।

মধুর নিজের দুই পরিবার। প্রথমার এক ছেলে তিন মেয়ে। পাঠিকা রাগ করবেন না: মধু বিরক্ত হয়ে দ্বিতীয়াকে ঘরে এনেছে। তিন বছর যায়— একেবারেই বাঁজা নাকি। আরেকটি পুত্র হলে ভালো ছিলো। শাস্ত্রে বলে এক পুত্রকে অপুত্রকের শামিল। জীবনকো কোই ঠিকানা হ্যায়। অবশ্য সে তার সতরো বছরের ছেলেকে ইতিমধ্যে বিবাহ দিয়েছে।[১৫]

অমিয়ভূষণের রচনা থেকে ষোড়শ শতকের বাংলার পারিবারিক - সামাজিক জীবনের ছবি বেশ পরিবূর্ণ ভাবেই উন্মোচিত হয় । লক্ষণীয় সমাজের কাছে পুত্র সন্তানই ছিল আকাঙ্ক্ষিত। আজও মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত সমাজে বিষয়টির খুব বেশি পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। এক পুত্র থাকলেও পত্নী একাধিক পুত্র ধারণে অক্ষম হলে স্বামী দ্বিতীয় বা ততোধিক বিবাহ করতেন। নারীর কাজ ছিল প্রধানত বিভিন্ন সেবা, পরিচর্যায় নিযুক্ত থাকা; পরিস্থিতিতে শিথিল হয়ে যায় তার সত্য ইঙ্গিত ব্যক্ত করেছেন—

> মাঝি মাল্লারা হিন্দু, কিন্তু বদর এবং বলা ? তার জন্য পাক করে তোপদার, জাতে সে ব্রাহ্মণ, কিন্তু সে বলার সঙ্গে একত্র পানাহার করে, বদরের ছোঁয়া খায়। বদর সম্ভবত মুসলমান; আর বলা ফিরিঙ্গি।[১৬]

বর্ণবিভেদের এই নিয়ম না মানা সমাজের উদারতা নয়। জলপথে একটি নৌকায় তা মানা সম্ভব নয় বলেই এই চিত্র। কিংবা সম্পন্ন ব্যক্তিরা এভাবেই প্রথা ভাঙার সাহস দেখাতে পারতেন বিত্তপ্রাবল্যে।

> একটি জাতির মানস - স্পন্দন, তার জাতীয় জীবনের আকাঙ্ক্ষা অনুভূতির স্বর নিহিত থাকে তার সাংস্কৃতিক পরিচয়ে। আর সংস্কৃতি বলতে বোঝায় একটি জাতির শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, ধর্ম, পোশাক পরিচ্ছদ, খাদ্যোপকরণসহ জীবনচারণার প্রতিটি অনুপঙ্খ-ই।

মধু রীতি রূপে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব স্বীকার করে। তার নৌকার গলুই-এ বেশ বড়ো করে আঁকা থাকে সিঁদুরের স্বস্তিকা চিহ্ন। কিন্তু মনে কোনো ধর্মীয় গোঁড়ামিভাবকে প্রশ্রয় দেয় না। বাণিজ্যসূত্রে বণিককে যেতে হয় দেশের নানা প্রান্তে প্রান্তরে। সমাজের বিভিন্ন ধারা সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিত ও মিশ্রিত হতে হয়। তার ফলে তার মধ্যে তৈরি হতে পারে ধর্মীয় উদারভাব। উপন্যাসের প্রথম অনুচ্ছেদের বর্ণনায় লেখক লিখেছেন— 'চলেও যেন সাক্ষাৎ কালীমায়ের পুতি'। আবার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আছে— 'তার নাকের উপরে টানা রসকলি' যা বৈষ্ণবীয় ভাবধারার আচরণগত অভিজ্ঞান। এটা সম্ভব হল কীভাবে ? এ বিষয়ে একজন সমালোচকের মত যথার্থ বলে মনে হয়—

> রসকলির মধ্যে বৈষ্ণব সহজিয়া এবং কালীমায়ের পুতি চিত্রকল্পে শাক্ত - কাল্ট, অর্থাৎ মধ্যযুগের দুয়ের মিশ্রণে বাঙালির জাতিসত্তা গড়ে উঠেছিল। তাই বাঙালির স্বভাবের বৈপরীত্য ঐতিহাসিক ঘটনা ব্রাহ্মণ পাকে রেখে যেমন জাতপাতের ঘেরা টোপ ভেঙে দেয়। এই ঐতিহাসিক বাস্তবতা আজও দক্ষিণ বা উত্তর ভারতের জাতপাতের কাল্ট থেকে বাঙালি সমাজকে পৃথক মাত্রা দান করেছে।[১৭]

স্বল্প পরিসরে লিখিত এই উপন্যাসটিতে ষোড়শ শতকের বাংলার খাদ্যাভ্যাস, অভ্যাস, পোশাক পরিচ্ছদ সহ অস্ত্রশস্ত্রের পরিচয় দিয়ে ও বাংলার জাতিগত সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনের সামগ্রিক চালচিত্র নির্মাণ করেছে। যেমন:

খাদ্যাভাস— বাঙালি কোনো সময়েই নিরামিষপ্রিয় নয়। বলা যায় মাছ বাঙালির প্রধান প্রিয় খাদ্যতালিকার একটি। আমিষ রূপে মাংসেরও যথেষ্ট কদর ছিল। নুন, মশলা ভাজা, জিরে আর ছ্যাঁচা গোলমরিচ দিয়ে চর্বি শুদ্ধ ঝলসানো হরিণের মাংসের ঘ্রাণ আকাশ - বাতাস মথিত করে। বিত্তের অধিকারী বণিক সমাজে খাদ্যে, পানীয়ে ও নেশায় বেশ বিলাসি ও শৌখিন। ঘন্টায় ঘন্টায় মধু পান খায়। মদ্যপান বেশি না হলেও অনভ্যস্ত নয়। তামাকের সঙ্গে চন্দনকুচি মিশিয়ে সেই তামাক সে সেবন করে। তার কাকা চুয়া ভিজিয়ে সুগন্ধি করে তারপর চরস টানতেন। ফিরিঙ্গির আগমণে বজরায় চলছে হুইস্কি - ওয়াইন। বিভিন্ন উৎসবে নেশার দ্রব্যরূপে জ্বাল দেওয়া গোলাপ জল মেশানো ভাঙের প্রচলন ছিল।

অভ্যাস— মনুষ্য জীবনের প্রয়োজন বা কামনা কেবল খাদ্যগ্রহণের সীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার ক্ষুধানিবৃত্তির আঙিনা ছাড়িয়ে নানা ক্রিয়াকলা, আচার, আচরণ, অভ্যাস, রীতি-নীতিতে বহমান হয় জীবন-চর্যা। মধুর দিনযাপনের সময় নানা অভ্যাসের আকর্ষণের ভালো লাগা দিয়ে অতিবাহিত হয়। যেমন দেখি বজরার পাঠাতনে কুর্সি টেনে বিকেলে পশ্চিমি রোদ গায়ে লাগান মধু সাধু খাঁ। ক্রীতদাস বদর তাকে গা-হাত-পা, মাথা টিপে শারীরিক আরাম দিতে প্রয়াসী হয় যা তার বিলাসিতা ও প্রভুত্বের পরিচায়ক। তামাকের সঙ্গে চন্দনকুচি মেশানো তার নিজেরেই আবিষ্কার। সন্ধ্যার সময় ত্বমন্দের পাত্র ও নানা সুবাসিত নানা সুখাদ্য সহযোগে বন্ধুর সঙ্গে আলাপ- এক ধরনের সাংস্কৃতিরই পরিচায়ক। যখন ফিরিঙ্গি পর্যটক প্রশ্ন করে—'টাব্যাকু অর ওয়াইন' তখন মধুর উত্তর 'বোথ'। বণিক সভার এই আসরে বারনারী বা নর্তকীর উপস্থিতিই স্বাভাবিক। কিন্তু বজরায় 'নো উইমেন, ইউ সি।' তা না থাকায় মধুর তামাক ও মদ্য দুয়েরই প্রয়োজন।

অস্ত্রাদি উপকরণ— ষোড়শ শতাব্দীর বাংলায় অস্ত্রের ব্যবহার ছিল। শাসক শ্রেণি ভিন্ন অন্য শ্রেণির মানুষ তার পেসা ও প্রয়োজন অনুযায়ী অস্ত্র রাখতে পারত। যেমন নৌকায় থাকত একাধিক তোপ, টোটা, ভাল্লা, দস্যুদের সঙ্গে যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে তা ব্যবহার করা হত। এছাড়াও শিকার করার জন্য থাকত তির ধনুক। তিরের ডগায় তীক্ষ্ণ লোহার ফলক। তেল মাখানো থাকত ধনুকের কাঠে। আর হাতের অস্ত্ররূপে মধুর কাছে আমরা দেখেছি ছোটো তরোয়াল ও ছোরা নিয়ে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে।

পোশাক - পরিচ্ছদ ও প্রসাধনচর্চা— খাদ্য বিলাসী ও আয়সি মধুর পোশাক পরিচ্ছদেও আভিজাত্য ও বিলাসিতার ছাপ। টিকালো নাক, টানা চক্ষু এবং চিকন কালো মধু সার গায়ে পরিধেয় মোটা তসরের মেরজাই। হাতা কনুই পর্যন্ত। বোতামের পরিবর্তে বগলের নীচের ডোরে বাঁধা। পরনে দু-আঙুল চওড়া পাড়ের খাটো কিন্তু সূক্ষ্ম ধুতি। পায়ে চামড়ার বাটকি। তার দাসটি নপুসংক হলেও রূপবতী। অন্য ভুশকালো খোজা ক্রীতদাসের সঙ্গে বাদরের অনেক তফাৎ। বেশ ফরসা গায়ের রং। মাথার মাঝখানে বাবরি চুল, কপালে খয়েরের টিপ, হাতে সোনার বালা, হাতের পাতা এবং নখে মেহেন্দির রং, পরনে মালসাট করে পরা ধুতি, গায়ে ঝাঁপা গরদের বেঁটে ঝাপলা। মধু-র গায়ে অনেক সময় থাকে মখমলের মতো নরম পালকের মতো হাল্কা আর ওমদার নকশি - কাঁথা। পুরুষরা বাড়ির ভাইরে বেরোবার সময় থাকে গায়ে উড়নি কিংবা কাঁধের উপর দিয়ে ঝুলিয়ে ডান বগলের নীচে অনেক সময় তা আলগা ফাঁসও করা থাকে। মাথায় সাদা আঁশ মেশানো বাদামি চুলের ইংরেজ পর্যটকের পরিধান জামা ও জোব্বা। অন্য একটি দেশের মানুষের ও সংস্কৃতির সান্নিধ্যে এসে তার পরিধানে আছে ধুশ মকার পাজামা এবং

পিরহান। মধু সা ওড়নায় ব্যবহার করে দামি বকুল আতর যা এক ফোঁটা লাগালে সারাদিন সুগন্ধ ছড়ায়।

বাণিজ্যপথে নৌকায় জীবনযাত্রাটা একটু পৃথক প্রকৃতির। যেন খাদ্যের আয়োজনটা কখনো নৌকার পাটাতনে কখনো নদী নিকটবর্তী তীর সংলগ্ন এলাকায়— যেখানে কাছাকাছি অল্পবিস্তর জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করা যায় রান্নার জন্য প্রয়োজনীয় কাঠ, লকড়ি ইত্যাদি। আবার সামনের হাট বা বাজার থেকে ক্রয় করা হয় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি। নদীপথে চলতে চলতে মিলতে পারে শিকার। উপন্যাস মধ্যে একস্থানে বিস্তৃতভাবে এক হরিণ শিকার দৃশ্যের বর্ণনা আছে। সে দৃশ্য যেমন বাস্তব তেমন অব্যক্ত বেদনায় ইঙ্গিতবহ—

> চোখ সব চকচক করছে। গন্না হাল ছেড়ে উঠল। ছাই এর ভিতর দিকে ধনুকতীর বার করে আনল। তেল মাখিয়ে কালো করা দু আঙুল পুরু ধনুকের কাঠ; আঁতের তারে বাঁধা বেতের ছিলা টেনে পরালো গন্না।... ওদিকে হরিণীটাই আবার ডেকে উঠল, কী এক অব্যক্ত ব্যাকুলতা সে ডাকে। মানুষের সে ডাক বোঝার কথা নয়। তবু তা যেন মানুষ - পুরুষের বুকেও কাঁপতে থাকে।...তেমন প্রেম - প্রমত্ত অবস্থায় কারোরই কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। হরিণটা গলা লম্বা করে হরিণীর মুখের কাছে চাইবার চেষ্টা করছে। হরিণীটাই বরং বড় আর উঁচু। হরিণটার মাত্র দু শিং গজিয়েছে...[১৮]

চর্যাপদ থেকে জীবনানন্দ কিংবা তার পরেও কবিতা, উপন্যাসে ঘাই হরিণীর ডাকে ব্যাকুল ঘরছাড়া হরিণের রূপকে প্রেমকে পণও করার দ্যোতনা বেজে চলেছে নানা তানে।

নৌকা কখনো কখনো নোঙর করে জনজীবনের কাছে। চেকাখাতায় যেখানে ফিরিঙ্গি নেমে যাবে সেখানে যদিও দুপুরের পরে হাট বসবে তবু ভিড় জমতে থাকে তারও আগে থেকেই। হাটে সারাবছর ধরেই পড়ে থাকে খানকয়েক পাকাপোক্ত খোড়া চৌরী।

> ওপাশে দক্ষিণ থেকে নৌকায় আসা হাঁড়ি পাতিল তিজেলের মঠ উঠেছে যেন কুরোরদের। এদিকে ছাতনাগাছের নিচে পাশাপাশি দাঁড়ানো অনেকগুলো বেঁটে - বেঁটে ভুটিয়া ঘোড়া, লম্বা লেজ আর কপালে ঘাড়ে হাঁটুর গাঁটে লম্বা-লম্বা চুল। প্রস্রাবের গ্রন্ধে এগোবে কীৎ তার কাছেই ছোট একটা ধানের স্তূপ। কেনবার আগে চিটেতে ফুঁ দিয়ে পরখ করছে একজন। আর এর পাশ দিয়ে এগোলে আরেকটু ভিতর দিকে সেই দোকানগুলো। যেখানে এন্ডি আর ভোটকম্বল সাজান আছে। চামরীর লেজে পাবে যাতে চামর হয়, আর মাঝে মাঝে কস্তুরী—মৃগনাভি যার নাম।[১৯]

এভাবে দেশের উৎপাদন প্রক্রিয়ার কথা উপন্যাস মধ্যে অনুপস্থিত হলেও প্রসঙ্গক্রমে দেশের উৎপাদক শ্রেণি— কামার, কুমোর, চাষি, তাঁতি প্রভৃতির উৎপাদিত দ্রব্য ও সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছেন। আর ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার যে হাটের চিত্র তিনি দিয়েছেন তার সঙ্গে এই সময়ের হাট পরিবেশের খুব কম বেশি পার্থক্য নেই।

মধু সা একজন রুচিবান, সংস্কৃতিবান শিক্ষিত বাঙালি। যে অন্যূন চারটে ভাষা জানে। নিজ ভাষা রাঢ়ী ছাড়াও সংস্কৃত, ফারসি, হার্মাদি-মগই এবং বর্তমান নতুন বন্ধুটির সাহচর্যে ইংরেজি ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেছে। ফিরিঙ্গি পর্যটক রোজনামচা লেখে। মধু সে সম্পর্কে আগ্রহ বোধ করে। পয়ারের পরিবর্তে তা গদ্যে লিখিত হয় শুনে সে আরও বিস্মিত হয়। কারণ এদেশে পয়ার ছাড়া কিছু লেখা হয় না। সে জানে শিরোমণির ন্যায়শাস্ত্রের কথা। মঙ্গলকাব্য যে পয়ারে লিখিত তা সে জানে। কাব্যসাহিত্যের রসিক পাঠকও বলা যায় তাকে। সে কৃষ্ণকীর্তন পড়েছে। বানভট্টের কাদম্বরীর পত্রলেখার রূপবর্ণনায় তাদের তারাভরা সান্ধ্য আলাপন মধুর হয়ে ওঠে। ফিরিঙ্গিদের ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কেও সে আগ্রহ অনুভব করে। মধুর নৌ-সঙ্গী ইয়োরোপীয় পর্যটক ও শিক্ষামনস্ক সংস্কৃতিবান জ্ঞানপিপাসু গবেষক। সে প্রতিদিন লিখে রাখে তার যাত্রাকালের বিবরণ। বিধৃত হয়ে থাকে নানা সংস্কার, কুসংস্কার, ধর্ম, বিশ্বাস, মানবিক জীবন রসে সিক্ত ভারতের তথা বাংলার জলপথ থেকে দেখা এবং জানা নানা চিত্র- বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা। কখনো সে দেখে জগঝম্প, রামশিঙা, ঢাক প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের কিম্ভূত মিশ্রিত বাজনায় তেলে সিঁদুরে কান্নায় ধনুষ্টংকারের মতো ভয়ার্তে বেঁকে যাওয়া পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের যুবতীকে সতীদাহ দেওয়ার চরম আর্তনাদে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। জানতে চায় এরূপ দৃশ্য কেন? এ কী তাদের দেশের উইচ বা ভানের কাহিনি। স্বল্পভাষী গোপন স্বভাব পর্যটক বলে না। কিন্তু তার মানসচিত্রে ফুটে ওঠে—

> ফিরিঙ্গি বলল না, ভাবল, জেসুইট মিশিনারিদের বধের মাচায় তুলে চার টুকরো করা হয়। জীবিত থাকতেই নাড়িভুঁড়ি বার করে দেখিয়ে দেয়া হয়, ইউনিট্যারিয়ানদের খোঁটায় বেঁধে জীয়ন্ত ঝলসানো হয়, পিউরিট্যানদের দেয়া হয় ফাঁসি। দর্শকরা রানী বেজের জয়ধ্বনি। সে সবই ধর্মের জন্য।[২০]

মানুষে অবচেতন মনে সুপ্ত পাশবিকতাই ধর্মের নামে এই জান্তব দৃশ্যে বোধহয় জয়ধ্বনি দিয়ে ওঠে। মানব সমাজ সভ্যতার ইতিহাস অদ্ভুতভাবে লক্ষ করা যায় ক্ষমতার প্রতিপত্তি ও প্রাবল্যে পাশবিক দৃশ্যের পাশবিকতা যেন তার রূপ চরিত্র হারিয়ে স্তাবকগণের কাছে উল্লাসের কারণ হয়ে ওঠে।

বিত্ত যেখানে বিনা আয়াসেই তার স্ফীত কলেবর ক্রমাগত বৃদ্ধি করে সেখানে সেই বিত্তের মেদবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় নানা ব্যাভিচার। প্রায় সবদেশের রাজা - রানির কাহিনিতেই এমন গল্প ছড়িয়ে আছে। দূর অতীতের সেই গল্পের ওপর রং পড়তে পড়তে কখন তাতে ধর্মীয় গন্ধও যুক্ত হয়ে যায়। এমন করেই কামতায় গড়ে উঠেছে গোসানিমারী মন্দিরের ইতিহাস— কথকতা। কামতার রাজা নীলাম্বরের এক রানির নাম বনবালা। মন্ত্রীর যুবক পুত্র মনোহর তাকে কৃষ্ণকীর্তন পাঠ করে, গান করে শোনায়। ক্রমশ তাদের মধ্যে তৈরি হয় অবৈধ সম্পর্ক। ব্যভিচার গোপন থাকে না। রাজবিচারে প্রাণদণ্ড হয় মনোহরের। কামতার চণ্ডী চামুণ্ডার মন্দিরে 'তিথিতে তিথিতে' নরবলি দেওয়ার রীতি ছিল। একরাত্রে মনোহরকে বলি দেওয়া হয়। ব্রাহ্মণের পুত্র গোঁসাই বলে সেই থেকে মন্দিরের নাম হল গোসানিমারী।

জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মানসিক নৈকট্যই বোধহয় আত্মীয়তা বন্ধনের প্রধান সেতু। তাই নৌ - যাত্রাপথের এই বিস্তৃত পরিবেশে একে অপরের বিনিময় করেছে তাদের দেশের ধর্মভাবনা, পাপপুণ্য, সংস্কার, রীতি, সমাজ, অবস্থানের কথা। ফিরিঙ্গি যখন জিজ্ঞাসা করেছে তাদের জেসাসে মধুর আপত্তি আছে কী না? তখন মধুর উত্তর যে কোনো ভারতীয় মাত্রকেই

গর্বিত করে—

কিছু না। আমারদের এত অবতার, তোমরার এক মানতে কী আপত্তি হৈব? তবে আমাদের অবতার ভগবান যুদ্ধ জিতে— রাম বলো, কৃষ্ণ বলো। তোমারদের অবতার সি নিজে মরে, মারও যে ভাল হয় ত দেখালে।[২১]

এখানে বণিক মধুর উদার মানসিকতা ও পরধর্ম সহিষ্ণুতার মনোভাবটি ভারতীয় ধর্মীয় সম্প্রীতি এবং হার্দিক অনুভূতির জাতীয় চরিত্রগত বাতাবরণটিকে প্রকাশ করে।

এত স্বল্পায়তন পরিসরে একরেখ মেদবাহুল্যহীন কাটা কাট ভঙ্গিতে স্রষ্টা অমিয়ভূষণ প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য দুই জ্ঞান অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিত্বের স্বাভাবিক আগ্রহ প্রকাশের মধ্যে দিয়ে দুই মহাদেশের ধর্ম, সমাজ, সংস্কার সামগ্রিক জীবন- দর্শনের স্পন্দনকে মূর্ত করে তুলেছে। ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার বণিক তথা অবস্থাপন্ন সমাজ শুধু আর্থিক সঙ্গতিই নয়, বরং বৈচিত্র্যমুখী এবং বহুস্তরীয় জীবনের আকর্ষণে পার্থিব স্পৃহা, জ্ঞান এবং দার্শনিক চিন্তা - চেতনা সমৃদ্ধ।

আলগোছে বাঁ হাতের ক্ষতের উপরে একবার হাত বুলাল সে, ভাল উদ্দেশ্য কী?...কী হল? মানুষ যেন বাঁচে আর যেমন বাঁচা উচিত ছিল তার।[২২]

মধু সাধু খাঁ উপন্যাসের ইতিহাস চেতনা স্বাদেশিকতাবোধের গভীরতায় প্রোথিত। তার প্রপিতামহ, পিতামহ, পিতা, পিতৃব্য সকলেই স্বল্পায়ু ছিলেন। উপন্যাস মধ্যে বার বার ভারতীয় পুরুষের এই স্বল্প জীবনের বেদনা বোধ ধ্বনিত হয়েছে। তাই যে তার অন্তিম প্রার্থনা উপ্যাসের শেষ দুই ছত্রে অভিব্যক্ত হয়।

আর ভগবান, ভগবান, যদি মত হয়, ছেলের বেটা কিম্বা তস্য বেটা হয়ে এ দেশেতেই যেন জন্মাই যদি তেমন কিছু ঘটে যায়।[২৩]

বোধহয় পৃথিবীর সব দেশেই সবকালে জীবনের কারখানাঘরে সকল অভিজ্ঞতার মাড়াই পেষণের পর যা সত্য হয়ে পড়ে থাকে তার নাম বোধ হয় পৃথিবীর প্রতি, মানুষের প্রতি, জীবনের প্রতি কামনা বা আকাঙ্ক্ষা। বাইবেলের সেই আদ ইভের লাল আপেলের প্রতি আকর্ষণ হয়তো এই রূপবর্ণগন্ধময় জীবন— ভোগবাসনার ইঙ্গিতও। নিবিড় বনের ফাঁকে ফাঁকে শুভ্র নীলাভ উজ্জ্বল আকাশ - মেঘের ধরা পড়ার মতো মধু সাধু খাঁ ষোড়শ শতকের বাংলার বাণিজ্য ইতিহাস এবং জীবন - বহমানতার অভিজ্ঞান বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

অমিয়ভূষণের লেখনী সবসময়ই ভিন্নস্বাদী বিষয় - বৈচিত্র্যের ভাবনায় বহুপ্রজ। মধু সাধু খাঁ যেখানে ষোড়শ শতাব্দীর বাংলার সম্পন্ন জীবন ও সমাজ ব্যবস্থার চালচিত্র হয়ে ওঠে, মহিষকুড়ার উপকথা - তে লেখক পূর্বলিখিত ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রাক্ - স্বাধীনতা পর্বের ঔপনিবেশিক ভারতের প্রত্যন্ত গ্রামের পশুপালনও ভূ-ব্যবস্থাকেন্দ্রিক আর্থ-সামাজিক জীবনের রূপচিত্র এমন সীমিত পরিসরে সাবলীল ও বিশ্বস্তভাবে নির্মাণ করেছেন যা তার অপরিসীম জীবন - মমতা ও পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচায়ক হয়ে ওঠে।

মহিষকুড়া এমন একটি গ্রাম যার নাম কোনো স্বনামধন্য ইতিহাসে পাওয়া যাবে না। উত্তর - পূর্ব দিকের কোনো বিস্তীর্ণ শাসসারির ঘন জঙ্গল ঢাকা কোনো সবুজ সাগরে যেন বিচ্ছিন্ন ছোটো একটা দ্বীপের মতো গ্রামটি। নিরবচ্ছিন্ন হিংস্র অরণ্যানী প্রকৃতি। কারণ এখানে যেমন আছে বনের ক্রীড়াশীল হরিণ-হরিণী বিচিত্র পাখ-পাখালি বিষথলিযুক্ত খরিশগোখরো, প্রকাণ্ড শিঙের মহিষদল বা তীক্ষ্ণ দাঁতে রক্তপান করা বাঘরা বিভীষিকাময় যূথবদ্ধ মদমত্ত হাতির ছুটে চলা। এ হেন অরণ্য পরিবেষ্টিত মহিষকুড়ার এক প্রান্তীয় জনজাতির জীবন, জীবিকা, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থান শ্রেণিবিন্যাস, শোষণ, শোষণের রূপ সর্বোপরি জীবন-চারণার নানা অনুপঙ্খ সেভাবে রূপায়িত হয়েছে তাতে উন্মোচিত হয় ভারতের এক অনাবিষ্কৃত জনগোষ্ঠীর জীবন ইতিহাস।

মহিষকুড়া গ্রামের 'কুড়া' শব্দের অর্থ ডোবা, দোলা জমি এমনকী দহ হতে পারে। দহ হল নদীখাতের গভীরতর কিছু অংশ। এই মহিষকুড়া আদিতে ছিল নদীর নাম। গ্রামের মাঝখানে অবস্থিত পরস্পর ক্ষীণভাবে সংযুক্ত ছোটোবড়ো কয়েকটি খাদ। এই নদী যখন বহতা ছিল তখন বার বার এখানে জমে উঠত বুনো মহিষের আড্ডা। প্রায় পঁচিশ থেকে তিরিশটি মোষ নিয়ে গড়ে উঠত এক একটি দল। কোনো কোনো দলে মোষের সংখ্যা ছিল শতাধিক। জলের ধারে, আধডোবা চরে। ঘাসবনে জমে উঠত মোষেদের আড্ডা। বুনো মোষ পোষ মানিয়ে তাকে হাটে বিক্রি করা ছিল এখানকার মানুষের মুখ্য জীবিকা। মোষ ধরার এই জীবিকা যখন থেকে গ্রামে প্রাধান্য লাভ করেছে তখন থেকে এই গ্রামের নাম হয়েছে মহিষকুড়া।

সময় অগ্রসরণের সঙ্গে জীবিকার পথে আরেক ধাপ এগিয়েছে মানুষ। মোষ ধরা পেশা আর নেই। পরিবর্তে আছে মোঘবাথান। বাচ্চা মোষ, মাদি মোষ, পুর্ণবয়স্ক মোষ, মদ্দা, বলদ প্রভৃতি প্রায় পঁচিশটি মোষ নিয়ে গড়ে ওঠে এক একটি মোষবাধান। এবার এই মোষবাধান ঘিরে তৈরি হয় নানা শ্রেণির উপজীবিকা। আবার বিভিন্ন ধরনের মোষকে বিভিন্ন কাজে লাগানো হয়। যেমন কোনো মোঘ দুধ দেয়, কোনো মোষ লাঙল চষে। কোনো বদল তামাকের খেতে চাষ দেয়। সেখানে মোষ লালন - পালন করা, দুধ সংগ্রহ করা— বেচা, সাহ তৈরি করা প্রভৃতি নানা উপজীকিা তৈরি হয়। জীবিকা অর্জনের এমনই ন্যূতম উপায় এই অঞ্চলে।

এই স্থানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ জীবিকা হল গোরু মোষ জবাই করা বা ছাল ছাড়ানো, বা পশুকে খাসি বা বন্ধ্যা করে তোলা। এ কাজ যেমন যন্ত্রণাদীর্ণ তেমনি ভয়ংকর। এই শ্রেণির মানুষদের প্রকৃতিতে হয়তো একধরনের নৃশংসতাকে উপভোগ করার প্রবণতা থাকে। যেমন এই স্বল্পায়তন উপন্যাস মধ্যে ছমিরকে দু-বার এ কাজের চিত্রে দেখা গেছে। কিংবা তার দ্বিতীয়বার একটি অল্প বয়স্ক 'হরিণ রঙের ষাঁড়'কে অন্য একটি গাভীর ফাঁদ পেতে গলায় দড়ি পরিয়ে যে হত্যা দৃশ্যের চিত্রায়ন হয়েছে তা যে কোনো সংবেদনশীল মানুষের কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক—

ছমির দেখল, গাভীটা ঘারিঘরের কাছে গাবগাছটার নিচে দাঁড়িয়েছে ষাঁড়টাকে পিছনে নিয়ে আর একবার ছুটবার আগে, ছমির বুদ্ধি খুঁজে পেল যেন। হাতের দড়িতে ঢিল দিতেই ষাঁড়টা গাবছাবের দিকে ছুটল। এখানেই ছমিরের ওস্তাদি।

ষাঁড়টা ছুটল গাছটার ডানদিকে, ছমির দৌড়াল বাঁদিকে। দড়িটা ছিঁড়ল না, ষাঁড়টা গলার দড়ির টানে বে-দম হয়ে জিভ বার করে থেমে গেল। এই খেলার এই যেন নিয়ম।[২৪]

অবাক লাগতেও সত্যি— 'এটা খুব মজার ব্যাপারের মতো এখানকার লোকদেরও টানে।' এবং শহরের বাবুদের কোনো কোনো সময় এ খেলা দেখানোর জন্য এমন আয়োজন করা হয়। যত পরিশীলিত হোক না কোন মানুষের কোনো মনস্তাত্ত্বিক কূট গভীরে হয়তো আদিম বাসনা ভিতরে ভিতরে কাজ করে যায়। তাই সমাজের সবচেয়ে মস্তিষ্কবান জীব মানুষ অপর জীবের হত্যাকাণ্ডের উপভোগ্যতা অনুভব করে।

এই উপন্যাসেরই আরেকটা অত্যন্ত মানবিক এবং অনুভূতি সম্পন্ন মানুষ আসফাক গোরু - মোষের চিৎকার শোনার ভয়ে বাইরে কোথাও গিয়ে বসে থাকে। ষাঁড় জবাই করা ছাড়া ছমিরের অন্য কাজও আছে। খড়ি ফাড়া, তরকারি - বাগান তদবির করা, হাঁস-মুরগি দেখা ইত্যাদি।

কৃষিকাজ এখানেও মুখ্য নয়। এখানে স্বল্প পরিমাণে হলেও চাষাবাসের কথা আছে। নাসির এবং সাত্তার এখানে লাঙ্গলদার। ধান চাষ হয়। কিন্তু ধান চাষ অপেক্ষা তামাকের চাষকে এখানে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। এরা খেত মজুর। কারণ বিত্তবানদেরই জমি থাকে আর অর্থবান অন্যের শ্রমকে ব্যবহার করে নেয় প্রয়োজনমতো। তাই নাসির ও সাত্তার চাষ দেওয়া ছাড়াও খড়কুটো জড়ো করা, পোড়ানো, সার দেওয়া, আল বাঁধা, পাতা কাটা প্রভৃতি মজুরিহীন আনুষঙ্গিক কাজ করে থাকে।

আসলে লেখক এক অত্যন্ত সুনিপুণ কৌশল এবং দক্ষ বয়ন ক্ষমতার ভিতর দিয়ে ভারতের এক প্রান্তবর্তী জঙ্গল অঞ্চলের প্রান্তিক জনজাতির মধ্যেও কীভাবে শ্রেণিবিন্যাস; ক্ষমতাবান - বিত্তবান, শ্রমিক, ভূ-দাস প্রভৃতি শোষক-শোষিত সম্পর্ক, তাদের দুর্বল, প্রায় অবলম্বনহীন অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনের ইতিবৃত্তটি রূপায়িত করেছেন।

জাফরুল্লা এ অঞ্চলের বিত্তবান মানুষ। যদিও শহরের বা তথাকথিত সভ্যশ্রেণীর ধনীর সঙ্গে তার সম্পদ ও বিত্তের চরিত্রগত প্রভেদ আছে। তার মহিষবাধান আছে। কাঠের তৈরি প্রশস্ত তিনখানা ঘর ছাড়াও রং করা দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বড়ো একটি দর্শনীয় দ্বারিঘর আছে। তার জমির পরিমাণ প্রায় আটশো বিঘা। এর মধ্যে কিছু ধানের কিছু তামাকের। এই আটশো বিঘা জমি তার একদিনে হয়নি। বনের মধ্যে ডুবে থাকা জমিও জাফরের। সরকার থেকে জমি সেট্‌লমেন্টের সময় এ বিষয়ে মামলা হয়। নতুন আইনে প্রথমে সে দুশো বিঘা জমি ফিরিয়ে দিলেও বিত্ত কখনো আইনও ক্রয় করে। আইনের ফাঁকফোকর দিয়েই সম্পন্ন ব্যক্তি সক্রিয় রাখে আইন বহির্ভূত বিষয়। চারবিবি, একছেলে, এমনকী পাঁচজন চাকরের নামেও তখন জমি লিখিয়ে দিয়েছিল সে। কিন্তু পরে সকলকে একশো টাকা করে নগদ দিয়ে পাঁচ হাজার টাকার রেহানিখত অর্থাৎ ধার লিখিয়ে সেই বাজেয়াপ্ত জমি পুনরায় ফিরিয়ে এনেছিল জাফর।

আর এই উপন্যাসের অন্যতম নায়ক কিংবা তাকেই প্রকৃত নায়ক বলা যায় কারণ মহিষকুড়া নামক এক অখ্যাত অরণ্যানীর অনভিজাত জাতির তথা একেবারে প্রান্তবর্তী মানুষের প্রতিভূ সে। তার নিয়মমাফিক পরিচয় সে জাফরের চাকর। কিন্তু এইখানেই এই চরিত্রটির পরিচয় শেষ নয়। বরং এই চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে অন্ত্যজ জনজাতির সমাজব্যবস্থার করুণ কিন্তু সত্যরূপটি লেখকের কলমে প্রতিফলিত হয়েছে। আসফাক জাফরুল্লার বাথানে আছে প্রায় সাত বছর। জাফরুল্লা যেখানে আটশো বিঘা জমি বিত্তের মালিক আসফাকের সেখানে সম্পদ বলতে একটি পুরোনো চৌরীঘর, নড়বড়ে মই, মরচে ধরা লাঙ্গল, পুরোনো ঘা-কাঁধে একটি বলদ।

উপন্যাসে প্রথম তাকে দেখা যায় সে শহরে গেছে এক গুরুত্বপূর্ণ কাজে যা মানুষের জীবনদায়ী; জাফরুল্লার ওষুধ আনতে। তার ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফেরার কথা ছিল, সন্ধের সময়। তার পরিবর্তে সে ফিরেছে ভোরবেলা। একটিমাত্র ঘটনাকে তন্তু করে ঔপন্যাসিক দক্ষ কলাকুশলীতে চরিত্রটির মনস্তাত্ত্বিক গভীরে প্রবেশ করে মানব চরিত্র এবং সাজ-মানব সম্পর্কের রুদ্ধ অনালোকিত বিষয়গুলির উন্মোচন করেছেন। তাতে হয়তো অনেক সভ্যশ্রেণির মানুষেরই অন্ত্যজ জীবনের প্রতি ভাবনা - ধারণার পরিবর্তন ঘটবে। চরিত্রটি প্রকৃতিতে আরণ্য জীবনের সরলতা এবং মহিষকুড়ার মোষ কেন্দ্রিক আদিম দুর্দামতার প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ দিয়ে গড়া। পাকা পিচের সড়ক ছেড়ে সে বনের মধ্যে দিয়ে শহরে যেতে ভালোবাসে। কারণ বনে দেখা হবে ছোটো ছোটো নদী, ঝরনা, ঝোরা। কিন্তু রূপময়ী অরণ্য - প্রকৃতি, রহস্যময়ীও। আর যেখানেই রহস্যময়তা সেখানেই অজানা আশঙ্কা ইত্যাদি। কারণ গাছের নীচে চলতে চলতে বেহিসেবি বলে হঠাৎ পৌঁছোতে হবে একমানুষ সমান কোনো ঘাসের জঙ্গলে, সেখান দিয়ে আর মানুষ চলতে পারে না। এবং যা শহরে যাওয়ার পরিবর্তে তাকে শহর থেকে আর কোনো দূরবর্তী দুর্গম স্থানে নিয়ে যেতে পারে এমন পথ ধরেছে আসফাক। কেন? ভাবতে অন্যরকম লাগলেও সত্যি এহেন সম্বলহীন ভূ-দাস চায় একটুখানি নির্জনতা। নিজের সঙ্গে নিজের হিসেব মেলানোর পরিসর। সচেতন মনের অন্যপারের সুপ্ত অপ্রকাশিত রূপভাবনাহীন মানসিক গ্রন্থিগুলিকে অনুভূতির জগতে আনার প্রয়াস। লেখক খুব সচেতন ভাবেই বোধহয় উপন্যাসের একেবারে সূচনা অংশে এই তাৎপর্যবাহী ইঙ্গিতটি লিপিবদ্ধ করেছেন। বহুপূর্বে বৈষ্ণব কবি জ্ঞান দাস লিখেছিলেন, 'যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল'। আর অমিয়ভূষণ মনকেই তুলনা করলেন বনের সঙ্গে—

> বোধহয় তুলনাটাই বদলানো ভালো। অরণ্য সম্বন্ধে নানারকমের কথা যে মনে হয়, যার কোনো একটাকেই যথার্থ যে মনে হয় না, তার কারণ বোধহয় এই যে, সে বরং অবচেতন মনের মতো। ...এদিক - ওদিক বনের গভীরে ডুবে থাকা গ্রাম, আর তাদের ঘিরে থাকা প্রাণীদের নিঃশব্দ, কখনো বা চাপা তর্জন - গর্জনযুক্ত পদসঞ্চার স্পন্দিত বন— এসব মিলে যেন একটাই মন, বন যেন মনের অবচেতন অংশ। আর তা যদি হয় তবে মহিষকুড়ার মতো গ্রামগুলি অস্ফুট আবেগের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে।[২৫]

সভ্যলোকের আলোকের বাইরে এইসব অজ্ঞাত জনগোষ্ঠীর এমনই তুলনা হতে পারে। আসলে আসফাক ভারতের এক বিদায়ী তথাকথিত অসভ্য বুনো বর্বর হারিয়ে যাওয়া সভ্যতার নায়ক। আধুনিক প্রযুক্তির জ্ঞান - বিজ্ঞানের আবিষ্কারে, প্রবল সভ্যতার চাপে এই আদিম বনভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা, জীবনরূপকে নতি স্বীকার করতেই হয়। তবু সেই মৃত্তিকা বা

বনভূমি সম্পৃক্ত সভ্যতার সারল্য, সাহসিকতা, অকৃত্রিম বলিষ্ঠ প্রকাশ চিরকাল মানব মনের একটা কোণকে আকর্ষণ করে থাকে। একথা তো সত্য সমাজ যত সভ্য হয়েছে জটিলতা বেড়েছে আরও বেশি অথচ কিছু মৌলিক ভূমিকায় মানুষের শিকড় থেকে গেছে সেই আদিমে। আর তাই নতুন গজিয়ে ওঠা বনের মধ্যে যথেচ্ছ স্বাধীন হওয়ার পরিধিতে আসফাকের আচরণ।

> সে কি পথ হারিয়ে ফেলেছে? এখন সে যতই হাঁটবে ততই বনের গভীরে ঢুকবে? সে আবার থমকে দাঁড়াল। দেখল, ঘাসবনের উপরে উপরে এমন গাছের মাথাগুলো এক হয়ে হয়ে ক্রমশ ঘন ছায়া বিস্তার করেছে।... সে তাড়াতাড়ি চলতে লাগল। আর সেই অবস্থায় গাছের পাতার ছায়া যেমন তার গায়ের উপরে ছায়ার ছবির আঁকছিল, তার মধ্যেও ভয় আর সাহস, আনন্দ আর উত্তেজনা— নানা রেখা এঁকে নাচতে থাকল। সে এবার আরও জোরে, আরও টেনে আঁ - আঁ - ড় শব্দ করে উঠল, কান পেতে শুনল, প্রতিধ্বনি যেন একটা উঠছে। আর সেই মুহূর্তে সে অনুভব করল, সে মোষ হয়ে গিয়েছে। একটা বুনো মোষ সে নিজেই।[২৬]

এইভাবে মহিষকুড়ার গ্রামের নানা মিথের মধ্যে ছড়িয়ে থাকা লুপ্তপ্রায় অরণ্য - জীবনকে ধারণ ও লালন করতে চায় সে।

চরিত্রটির এ হেন আচরণকে একটি ভূ-সহায়হীন দরিদ্র মানুষের মনোবিকার বা বুদ্ধিহীনতা ভাবলে ভুল হবে। কারণ চরিত্রটি একটি অত্যন্ত বিবেকবান ও প্রবল দায়িত্ববোধ সম্পন্ন মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র। সে দায়িত্ববোধ বোধহয় অন্য অনেক সভ্য জগতের মানুষের মধ্যেই পাওয়া যাবে না। কারণ উপন্যাস মধ্যে লেখক বার বার অঙ্কন করেছেন তার দেরি করে ওষুধ নিয়ে ফেরার জন্য আত্মগ্লানিবোধ এবং ভয়ার্ততা।

কারণ সে জানে ওষুধ যা মানুষের জীবনদায়ী— তার সময়ের যথার্থতা। দেরি করে ওষুধ নিয়ে ফেরার বিষয়টিকে কেন্দ্রকরে তার মধ্যে একটি মনস্তাত্ত্বিক কূটজাল তৈরি হয়েছে। কখনো প্রতিদিন ভোর বেলার মতো কাজ শুরু করার অভিনয় করেছে। কখনো মনে করেছে সঙ্গীরা আর সঙ্গে স্বাভাবিক আচরণ করছে না। এই অনুতাপ বোধ থেকে তৈরি হয়েছে মানসিক চাঞ্চল্য। কিংবা কখনো তার হৃদকম্প প্রায় স্থবির হয়ে গেছে এই ভাবনায়—

> সে জাফারুল্লার ঘরের খোলা নিঃশব্দ জানলার দিকে চাইল আর তার হাত পা যেন অবশ হয়ে গেল। তাহলে দেরি বলে আখেরি দেরি করেছে সে।[২৭]

তার আন্তরিক অনুভূতিসম্পন্ন মনে অনুতাপবোধ, বিচারবোধ থাকলেও তার প্রভুর জগতে বিষয়টি অবান্তর। অনায়াসে জাফরুল্লা চলে গেছে হাকিমের সঙ্গে নতুন ভক্‌ভকি চড়ে সদরে। চরিত্রটি কিন্তু নির্বোধ নয়। প্রশ্ন দিয়ে, যুক্তি দিয়ে সে নিজের কাজকে, জাফরুল্লার আচরণকে বিচার করে, বিশ্লেষণ করে একটি সিদ্ধান্ত তৈরি করেছে। মিলিয়ে নিয়ে প্রচুর সঙ্গে তার দায়বদ্ধতার অঙ্ক—

> একটা লম্বা শ্বাস ফেলে আসফাক অন্ধকারকে বলল, 'তো, ব্যাপারি। তোমরা থাপ্পড় মারছেন, দশ বিগা ভুঁই দিছেন, মুইও চাষ দেং নাই। মুই ওষুধ আনং নাই, তোমরাও না-মরেন। তামাম শুধু।'[২৮]

অন্য চাকরানের মতো জাফরুল্লা তাকে দশ বিঘা জমি দিয়েছিল। নাসির, সাত্তার, ছ দুপুর যেখানে তাদের চাকরন ভোগ করে সেখানে আসফাকের জমি পরে একসময় সুগন্ধি ভোগদানের জন্য পছন্দ করে জাফরুল্লা। আসফাক সম্পর্কে লেখক লিখেছেন:

> নদী, চাষের ক্ষেত এবং বন সম্বন্ধে এইসব দার্শনিক চিন্তা শেষ করে আসফাক আবার খামারের দিকে ফিরল।[২৯]

সুতরাং চরিত্রটির গভীরতা বা অনুভববেদ্যতা সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে না।

এহেন আসফাকের জীবন কিন্তু চিরদিন এরকম ছিল না। বছর সাতেক আগে পিতার মৃত্যুর পর নতুন বর্গাদার কর্তৃক উৎখাত হয়ে ক্ষুধার অন্বেষণে সে পায়ে হাঁটা পথ ধরেছিল। আর এই পথেই খাদ্য অন্বেষণ করতে গিয়ে পেয়েছিল তার জীবনের আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ, তার প্রেম, স্বপ্ন ভালোবাসর নারী কমরুনকে। কমরুন তখন দল-পরিত্যক্তা। কমরুনদের জীবন ভদ্রশ্রেণির মতো কোনো স্থায়ী জীবন নয়। তাদের বনের মধ্যে পথের ধারে, স্থানে স্থানে অস্থায়ী তাঁবু ফেলে কাটানো বাউদিয়া জীবন। এখানে ঔপন্যাসিক খুব স্বল্প কয়েকটি রেখা হলেও বাউদিয়া জীবনযাত্রার যে ভাষাচিত্র অঙ্কন করেছেন তা যেমন বিশ্বস্ত, সজীব তেমনই বর্ণোজ্জ্বল। এই বাউদিয়া জীবনের কোনো গন্তব্যস্থল নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু তারা কেবল চরেই বেড়ায়। বন-ই এদের আশ্রয়। মূলত অসাম বা তারও উত্তর - পূর্ব দিকের জঙ্গলে এদের গতিবিধি। পথ চলতে চলতে যেখানে সুবিধা বোঝে সেখানে তাঁবু ফেলে, হাত তিনেক উঁচু একটা করে বাঁশের আড়ের উপর দিয়ে একটা করে কাপড় দু-দিকে নামিয়ে এনে চারটে খোঁটায় কাপড়ের চার কোণ বেঁধে তাঁবু তৈরি করা হয়। তার মধ্যেই থাকে তাদের রান্না খাওয়া, কাপড় প্রয়োজনীয় তৈজস সহ জীবন যাপনের যাবতীয় সরঞ্জাম। আট দশটা মোষকে নিয়ে গড়ে ওঠে একটি দল। আর এই মোষ -ই দলগঠনের ভিত্তি। একজন মানুষ যদি একটি গাবতান বা গর্ববতী মোষ করায়ত্ত করতে পারে তাহলেই সে গড়ে তুলতে পারে পৃথক আর একটি দল। প্রতিটি দলে থাকে একজন করে দলপতি। তাকে জানতে হয় দলের ইতিহাস।একাধিক ভাষার ব্যবহার। অসম্ভব সাহসি হয়ে বনের মোষ ধরতে হয়। পুলিশের চোখ এড়াতে হয়। কখনো বাচ্চা মোষ বিক্রয় করে সংগ্রহ করতে হয় টাকা। সেই টাকা দিয়ে ক্রয় করে দলের জন্য চাল আটা কাপড় প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস। এছাড়াও এরা বন থেকে লুকিয়ে চুরিয়ে মধু সংগ্রহ করে। মোষের বাড়তি দুধ থেকে মাখন তৈরি করে, ধনেশ পাখির চর্বি সংগ্রহ করে। বন থেকে সংগৃহীত হরীতকী বহেড়া ইত্যাদি বিক্রয় করে। এভাবেই নির্বাহ হয় তাদের জীবিকা।

এখানেই দল পরিত্যক্ত অবস্থায় কমরুনকে পেয়েছিল আসফাক। কামরুনের স্বামীর তখন বসন্ত।

> সে তখন দেখল, তাঁবুর নিচে মাটিতে একটা চটের বিছানায় এক পুরুষের মৃতদেহ— সারা গায়ে ঘা আর ফোস্কা।[৩০]

নির্জন বনে একাকী দাঁড়িয়ে স্বামীর সৎকারহীন দেহ নিয়ে কাঁদছিল কমরুন। সেই কান্না শুনেই আসফাক তাকে দেখতে পায়। তারপর কোনোরকমে দুজনে মিলে ঝোরার কাছে কাঁকর পাথর মেশানো মাটির পাড়ে মাছ ধরে রাখার জন্যে গর্তে কবর

দিয়েছিল তাকে। যাপিত জীবনের মতোই বাউদিয়া জীবনে মৃত্যুর পরের অবস্থা এমনই আড়ম্বরবিহীন নিঃশব্দ। এরপর আসফাক সারা গায়ে কাদা মেখে খাবার জন্য পেয়েছিল কয়েকটা চ্যাং, গজার, আর কুচকুচে কালো সাপের মতো বড়ো কুচলা মাছ। কিন্তু তার কাছে আগুন ছিল না। মাছ যে পোড়াতে হবে। আগুন থাকতে পারে কি ওই মেয়ে মানুষটার কাছে?

আর মেয়েমানুষটার অবস্থা! শ্রান্ত ক্লান্ত জীর্ণ কমরুন বলেছিল মড়া ছোঁয়ার পর স্নান না করে কেউ খায় না। বিশেষ করে সেই বসন্তের মড়া। এহেন এই পরিমার্জিত সংস্কারহীন, গন্তব্য ঠিকানাহীন জীবনেও কিন্তু থাকে তাদের মতো সংস্কার, আচার, শোধন প্রক্রিয়া। ফলে কমরুন বাঁশের চুপড়ি, কয়েকটা বাঁশের লাঠি, শাড়ি, লুঙ্গি, তাঁবু খাটানোর কাপড় ইত্যাদি জীবনের যৎসামান্য যাবতীয় তৈজস ধুয়ে পরিস্নাত হয়ে খাদ্য গ্রহণ করেছিল। এরপর এল রাত। রাতে বনের একমাত্র মস্ত সহায় পোষা মোষ। আসফাককে মোষের পাশে শুতে দিয়ে কমরুন কোথায় গেল? যেখানে সেটা নিরুদ্দেশ জঙ্গল—

> প্রথম ঘুমের পর আসফাক একবার উঠেছিল। অন্যদিন যেরকম হয় না তেমন একটা ভয় ভয় করছিল। শালগাছের ফাঁক দিয়ে আবছা এক রকমের আলো। তাতে গাছপালার আকার বোঝা যায়। চেনা যায় না। সে দেখেছিল, মোষটা একটা ঝাঁকড়া গায়ের তলায় কয়েক হাত দূরে শুয়ে আছে। সে উঠে গিয়ে মোষটার কাছাকাছি, তার পিঠ ঘেঁষে শুয়েছিল। ভোর রাতে পাশ ফিরতে গিয়ে সে চমকে উঠেছিল। কিছুক্ষণ থেকেই তার ঘুমটা হালকা হয়ে এসেছিল। এতক্ষণ সে অনুভব করছিল, মোষের গা-ই তার গায়ে লাগছে। বুকের কাছে হাত দিয়ে চমকে উঠে বসল। কারণ তার হাতে যা লেগেছে তা হয় মানুষের মাথা কিংবা অন্য কোনো জন্তুর পশম ঢাকা শরীর। সে ভোর - ভোর আলোতে দেখতে পেয়েছিল, তার আর মোষটার পিঠের মধ্যে যে হাতখানেক ফাঁক, সেখানে শুয়ে ঘুমাচ্ছে কমরুণ।[৩১]

কিন্তু ভোর হতেই কমরুনকে আর দেখা যায়নি। ঝোরার পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কামরুনের বাঁশের টুকরোটি দেখতে পেল আসফাক। কিন্তু কমরুনকে দেখা গেল না। অবশেষে তাকে দেখা গেল নদীর আসল স্রোত নয়, বরং তিরতির করে বয়ে চলা স্রোতের বাঁকে—

> বিস্ময়ের মতো শোনালোও জন্মদরিদ্র আসফাক সেই প্রথম এক রত্ন দেখেছিল। নীলাভ বেগুনী রঙের মতো মেঘ - মেঘ পাহাড়ের কোলে সবুজ মেঘ-মেঘ বনের মাথা। বাদামী রঙের সমান্তরাল সরলরেখার মতো গাছের গুঁড়ি, তার কোলে হাল্কা নীল নদীর জল। ... কখনও বা মোষ রঙের পাথরের আড়ালে বাঁক নিয়েছে, সেকানে সকালের চক্‌চকে আলোয় নিরাবরণ এক বাঁকে ভরা— জলে চক্‌চকে মেয়েমানুষের শরীর। তা এখন শাড়ীতে ঢাকা আছে বটে। কিন্তু কী এক সর্বগ্রাসী মাধুর্য কমরুনের মুখে, তার কপালে, একটু খোলা ঠোঁটদুটিতে, যার কোণে হাসি জড়ান মনে হয়। কেমন যেন অদ্ভুত শক্তিশালী টানে টানতে থাকে মানুষকে।[৩২]

এরপর বনের পথ ধরে তাদের দুজনের শুরু হয়েছে পথচলা। শীত পড়ে গেছে। বনের ঘাসের মধ্যে ফুল ফুটতে শুরু করেছে। বুড়ো মোষটাকে তাঁবুর কাছে বেঁধে খাদ্যের সন্ধানে তারা কখনো পেয়েছে তিতির, কখনো কুচলা, লোহা ঠুকে শুকনো ঘাসে আগুন জ্বেলে রান্না করে নতুন সালপাতায় ধোঁয়া - ওঠা গোলাপী মাংস খেতে দিয়েছে কামরুন। আসফাকের বোকা হৃদয় প্রশ্ন করেছে— এখানে এভাবে চিরজীবন চলে কী না? কমরুন জানিয়ে দিয়েছে যায় না। কারণ দুজনে দল হয় না। আসফাক যতদূর সম্ভব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে চেয়েছে অনেক কথা— কমরুনের অনেক বাচ্চা হলে দলটা ক্রমশ বাড়বে। কিন্তু দল গড়ার জন্য যে মোষ চায়। বুড়ি মোষের যে বাচ্চা হবে না। চায় দু-তিনটে ভাষার কথা বলতে জানা, পুলিশের হাতে ধরা না পড়ে রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেওয়া, আসপাক কী পারবে? আসফাক একেবারেই অনভিজ্ঞ কিশোর। কমরুণের চাইতেও ছ-সাত বছরের ছোটো। নিজের অযোগ্যতায় আসফাক মলিনমুখে চেয়েছিল। আর কমরুন? শুকনো নরম গায়ে শুয়ে একটু হেসে আসফাককে নিজের স্তনে টেনে নিয়েছিল। কিন্তু কমরুনই বা কী করবে? দল ছাড়া তো চলে না। দল পেলে আসফাক তার সঙ্গে থাকত কিনা সে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। ক্ষণস্থায়ী বসন্ত শেষ হয়ে গেলে নামে প্রবল বর্ষা। আর বাউদিয়া জীবনের সংকট বর্ষাকাল। তাঁবু খাটানোর মতো শুকনো মাটি পাওয়া যায় না। খাটালেও তাঁবুতে জল মানে না। পাখিরা পালায়। শিকার পাওয়া যায় না। নদী ঝোরা পুষ্টবতী হয়ে পথ আটকায়। জলে মাছ ও ধরা যায় না। বরং সে জল পেটে গেলে ভয়ংকর আমাশা। সুতরাং বন থেকে পালিয়ে মোষের নতুন গোবরের পদচিহ্ন দেখে রওয়ানা হয়েছিল সে পথে। না জেনেই তারা যেখানে পৌঁছেছিল সেই অঞ্চলের নাম মহিষকুড়া। বুড়ি মহিষটাও এর মধ্যে সাদা মণি নিয়ে কাদায় আটকে গেল। আর উঠল না।

আসফাকের সেই কমরুন এখন জামারুল্লার চার নম্বর বিবি। ঘুরতে ঘুরতে তারা যখন মহিষকুড়া গ্রামে তখন আসফাক নিযুক্ত হল জামারুল্লার খেতের কাছে। আর কমরুন? অন্দরে, বাহির ভিতরে। আসফাকের মজুরি একবেলা খাওয়া আর দিনে এক টাকা কিংবা একসের চাল। কামরুনও দু-বেলা পেটভরে খেতে পায়। সন্ধে বেলা চলে আসে আসফাকের কাছে। মাসখানেক এরকমই চলছিল আসফাক কমরুনের দাম্পত্য জীবন। কিন্তু হঠাৎই এক সন্ধ্যে থেকে কমরুন আর এল না। দারুণ বর্ষায় জাফরুল্লা চুপচাপ নিকা করেছিল কমরুনকে। কমরুন এখন জাফরুল্লার একমাত্র উত্তরাধিকারীর মা।

জাফলুল্লার বাড়িতে হাকিম বেড়াতে এসেছে। পূর্বদিনের পরিশ্রান্ত বিনিদ্র রাত্রি আসফাকের সঙ্গে হাকিমের দেখা হয়েছে আকস্মিকভাবেই। যদিও পরিকল্পিত ভাবে আসফাক নালিশ জানাতে চায়নি তথাপি এই বিশ্রস্ত আসফাকের চেহারা ও তার ভাষাভঙ্গি থেকে হাকিমের কাছে উপস্থাপিত হল তার প্রতি জাফারের শোষণ বঞ্চনার কথা। উপন্যাস মধ্যে একটি চিত্রকল্প আছে। একটি আস্তরণ পড়া গোবরের ঢিবির ওপর এক পরিপুষ্ট মোরগের ঠোকরানোর দৃশ্য দিয়ে এটি নির্মিত। চিত্রকল্পটাই আসফাকের সমগ্র জীবনের করুণ এবং জাফরুল্লার বিত্ত অহংকারী চরিত্রের দুর্বল সত্যরূপটিকে একটিমাত্র লহমায় পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত করে। দীর্ঘদিন সঞ্চিত আস্তরণ আবৃত গোবর চূড়া যেন লাঞ্ছিত আসফাকের পলি পড়তে থাকা অসার চৈতন্য আর শুকিয়ে যাওয়া গোবরের টুকরো। তার নরম অংশ বের করার মতো আসফাকের চৈতন্যের সাড়া অংশকে জাগিয়ে তুলেছে হাকিমের প্রশ্ন—

> কত টাকা পাও? খেতে পরতে দেয়, বলি মাইনা টাইনা পাচ্ছ তো?

না।

না?

না।[৩৩]

লেখক জানিয়েছেন সালিশ হল অব্যক্ত একবারের জন্যে হলেও তার সেই অবচেতন মনের অবদমিত অভিযোগগুলি সভ্য জগতের মানুষের সামনে প্রকাশের আলোয় নিয়ে এসেছে। ধনী সবরকম ভাবে নিঃশেষিত করে নিতে চায় তার অধীনস্থ চাকরটিকে। আসফাক জাফরের ক্রীতদাস। জাফর আসফাককে মানুষ নয়, বরং তার একটি অতি বিশ্বস্ত সজীবন সম্পত্তির আরম্ভ করে বিবিদের তদারক করা পর্যন্ত যাবতীয় সম্পত্তির প্রহরীত থাকতে হয় তাকে।

জাফরুল্লার অন্দর মহলের বিবরণ সূত্রে এ গ্রামের উচ্চ অবস্থা সম্পন্ন নারীদের জীবন যাপনের পরিচয় পাওয়া যায়। অখ্যাত অরণ্য কেন্দ্রিক সমাজেও এই শ্রেণির নারীরা প্রসারিত পরিসরে মহিলা ভৃত্য সব স্বচ্ছন্দ ও পরিহাসময় দিনযাপন করে। বিবিদের মধ্যে চলে একের অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা।

পঞ্চাশোর্ধ থেকে বিশ বাইশ এই ভিন্ন অসম বয়সি প্রত্যেক নারীই জাফরের ভোগ্য। ভিন্ন বয়সি নারীদের রূপ ও আচরণ পৃথক ভঙ্গির। বড়ো বিবির চুল সাদা এবং সে স্থূলকায়। মেজবিবিও স্থূল কিন্তু মজাপ্রিয় মানুষ। ছোটো বিবির বয়স ছাব্বিশ সাতাশ। রূপদক্ষ ও প্রসাধন প্রিয়। কামরুনের বয়স ত্রিশ - বত্রিশ। প্রসাধন প্রিয় না হলেও তার মধ্যে আছে এক স্বাভাবিক কমনীয় সৌন্দর্য। পরিধানের মধ্যে সূক্ষ্ম বস্ত্র এবং অলংকার। বিশেষত নাকফুল ও কানফুলের ব্যবহার বেশি। এই শ্রেণির নারীদের মধ্যে নেশার 'প্রচলন' আছে। পুরুষের অভাবে নারীই নারীকে সঙ্গ দেয়। মেজবিবির ঘরে আসফাক এই দৃশ্য দেখেছে। নিজ পুরুষের অভাবে অন্দর মহলের নারী ভৃত্যশ্রেণির পুরুষের সঙ্গে গল্পে আদান প্রদান ঘটায়। জাফরের অনুপস্থিতিতে আসফাক পাহারা দেয় কামরুনকে। ছলাৎ ছলাৎ রক্ত আর হৃদপৃণ্ডের ওঠাপড়া নিয়ে কামরুন নিজেকে সামলাতে চায়—

আজ রাইত থাকি যা, কিন্তু মোর গাও ছুঁয়্যা কথ কর আর তুই আসবু না।

জাফরুল্লার তিন বিবিই নিঃসন্তান। একমাত্র কমরুনই একটি সন্তান দিয়েছে। লক্ষণীয় এরপরে কমরুনও আর দ্বিতীয় সন্তানের মা হয়নি। শিক্ষিত মধুর পরিবারের মতোই প্রান্তবর্তী অঞ্চলের অশিক্ষিত বিত্তবান পরিবার তথা সমাজে নারীর প্রধান সাফল্য নির্ভর করে সন্তান ধারণের মধ্যে। সন্তান না হওয়ার সমস্ত দায় বর্তায় নারীদের উপরেই। পুরুষের অক্ষমতাকে সমাজ গণ্য করে না। কমরুন তার সন্তানকে শিখিয়েছে যে যতদিন বাঁচবে— আসফাককে সে যেন 'মিঞা সাহেব' বলে সম্বোধন করে। সারাজীবন ব্যাপী বয়ন করা তার প্রিয়তমার ভালোবাসা বা তার সমস্ত শ্রম সাধনার পুরুস্কার এই সম্বোধনটুকুই। প্রিয় আত্মজের মুখ থেকে আসফাককে ন্যূনতম এই সম্মানটুকু দিতে শিখিয়েছিল অসহায় কমরুন।

সদর থেকে ফিরে এসেছে জাফর। এমন নোংরা আকাশ আসফাক কোনোদিনই দেখেনি। মুন্নাফ আর আসফাককে মিঞা সাহেব বলছে না। হাকিমের কাছে অভিযোগ জানানোর কারণে জাফর অধিকাচ্যুত করেছে নিঃসহায়ের শেষ সম্বলটুকু। জাফর একটি নতুন ট্রাক এনেছে। সে পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছে। সেই উপলক্ষে ভোটবাবু পার্টির লোকেদের জন্য উৎসব আয়োজনে সারা রাত্রি ধরে চলেছে পশু হত্যার অবিরাম প্রক্রিয়া।

মাত্র অষ্টাআশি পৃষ্ঠার অবয়বে ভাষ্যরূপে এভাবেই মূর্ত হয়ে থাকে প্রবল পরাক্রমের কাছে এক দুর্দাম স্বাধীন বন্য প্রান্তিক সভ্যতার লুপ্ত হওয়ার ইতিহাস। এক স্বাধীনচেতা মনুষ্যত্বশীল ব্যক্তির ভূমিহীন ক্রীতদাস হয়ে তার জীবনের সমস্ত স্বাদ, তার স্বপ্ন, তার ভালোবাসার নারী— এমনকী আর আত্মজের কাছ থেকে পাওযা প্রিয় সম্বোধনটুকু হারানোরও নির্মম ট্র্যাজিডি। জাফরের প্রভাব প্রতিপত্তির কাছে তুচ্ছ হয়ে গেছে আসফাকের ব্যক্তি চিন্তা, নৈতিক বোধ, দায়িত্বশীলতা প্রভৃতি মনুষ্যগুণ। একটি মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচারক্ষমতা, উদীয়মান ক্ষমতা মদমত্ত শক্তির কাছে কীভাবে নিঃশোষিত হয়ে যায় ভারতের জঙ্গলকেন্দ্রিক প্রান্তবর্তী জনজাতি ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার সাংগঠিনক কাঠামো, তার রূপ, তার দ্বন্দ্ব, তার মিথে রপান্তরিত হওয়ার কাহিনি। যে কাহিনি একই সঙ্গে ব্যক্তিক ও সামাজিক রূপান্তরণের অনুপম শিল্পরূপ হয়ে ওঠে।

এখন একটি প্রশ্ন সঙ্গত মনে হয় অমিয়ভূষণ কেন দুই ভিন্ন জনঘোষ্ঠীর ইতিহাস রূপবন্ধ করতে নভেলেটের আঙ্গিক গ্রহণ করলেন? মধু সাধু খাঁ উপন্যাসের পৃষ্ঠা সংখ্যা একচল্লিশ। মহিষকুড়ার উপকথা-র পৃষ্ঠা সংখ্যা অষ্টআশি। কাহিনির মধ্যে উপন্যাস হয়ে ওঠার বিস্তৃত সম্ভাবনা ছিল যেখানে সেখানে নভেলেটের আঙ্গিকে সীমিত পরিসরে এই আয়োজন কেন? এটা কী নিছকই রূপবদল? মনে হয়, না কারণ দেখা যায় লেখক তাঁর এই সৃষ্টি দুটিতে কোনো ব্যক্তি জীবনের দ্বন্দ্ব, যন্ত্রণা বা ব্যক্তি মানুষের প্রসারিত সম্পর্ক বিন্যাসের টানাপোড়েন, ভাববেগ ছাড়াও দুটি কালের চিত্রকে রূপবন্ধ করতে চেয়েছেন। বর্তমান সময় থেকে দেখা দূরবর্তী সময়কে তার সামাজিক, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক পরিসরকে দুই ভিন্ন জনজাতির, এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতময় ষোড়শ শতাব্দীর বিত্তবান বণিক সমাজ, দুই ভারতের প্রত্যন্ত অরণ্যবেষ্টিত প্রায় অবলম্বনহীন জনসমাজের সামগ্রিক রূপটিকে শিল্পরূপ দান করেছেন। যেখানে উপন্যাসের মানব মনের ব্যাখ্যা বিস্তার বিশ্লেষণ মুখ্য নয়। লেখকের ঈপ্সিত অভিপ্রায়টি হল সময় ইতিহাসের দুই কালের জনসমাজকে ভাষারূপ দেওয়া। তাই বিস্তৃত সম্ভাবনাময় নভেলের রূপকে সংহত ও ঘনবন্ধ গঠনের নভেলেটের আঙ্গিকে বাণীবন্ধ করার প্রয়াস। আর এখানেই নভেলেট দুটির সার্থকতা।

তথ্যসূত্র :

১. Ian Reid, The short story, Methuen & Co. Ltd London, First Edition 1977.

২. ঐ

৩. Merriam websters Encyclopaedia of Literature, Published springfield, Massachustls, ISBN 08779, page 819

৪. Cassell's Encylpaedia of Literature 195, Secound Edit- (3 volume), 35. Pealian square. London. WcTR 4SG S.H. Steinberg. Pate 406.
৫. মজুমদার অমিয়ভূষণ, মধু সাধু খাঁ, অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র ৪, দেজ পাবলিশিং প্রথম প্রকাশ, জুন ২০০৭, পৃষ্ঠা : ২১
৬. ঐ : পৃষ্ঠা :২১
৭. ঐ : পৃষ্ঠা :২২
৮. ঐ : পৃষ্ঠা :২৩
৯. Sur, A. K. : History and Culture of Bengal, 1963
১০. মজুমদার রমেশচন্দ্র সম্পাদিত বাংলা দেশের ইতিহাস, লেখকবৃন্দ : ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুখময় ঘোষ, ড. অমরেন্দ্র লাহিড়ী, প্রকাশক : শ্রী সুরজিৎ দাস
১১. অমিয়ভূষণ রচনা সমগ্র ১, পৃষ্ঠ : ১৯
১২. সেন সুকুমার : বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ সংস্করণ ১৯৭৮, পৃষ্ঠা : ২০৫
১৩. মধু সাধু খাঁ, অমিয়ভুষণ রচনা সমগ্র ৪, পূর্বোক্ত : পৃষ্ঠা ২২
১৪. ঐ : পৃষ্ঠা : ২৯
১৫. ঐ : পৃষ্ঠা : ২২
১৬. ঐ : পৃষ্ঠা : ১৯
১৭. চট্টোপাধ্যায় সাধন : জাতীয়তাবোধ : প্রাচ্য, প্রতীচ্য এবং অমিষভূষণের 'মধু সাধু খাঁ,' উত্তরাধিকার, 'সাহিত্য' পত্রিকা, ১৯৯৫ ডিসেম্বর
১৮. মধু সাধু খাঁ, অমিয়ভূষণ রচনা সমগার ৪, পৃষ্ঠা : ২৬
১৯. ঐ : পৃষ্ঠা : ৩৬
২০. ঐ : পৃষ্ঠা : ২৪
২১. ঐ : পৃষ্ঠা : ৩৩
২২. ঐ : পৃষ্ঠা : ৩৮
২৩. ঐ : পৃষ্ঠা : ৪১
২৪. মজুমদার অমিয়ভূষণ, মহিষকুড়ার ইপকথা, উর্বী প্রকাশন, ২৮/৫ কনভেন্ট রোড, কলকাতা ৭০০০১৪, পৃষ্ঠা : ৩০, উপন্যাসটির রচনাকাল : শ্রাবণ ১৩৮৫, প্রথম প্রকাশ : শারদীয় পরিচয় ১৯৮০
২৫. ঐ : পৃষ্ঠা : ১২
২৬. ঐ : পৃষ্ঠা : ২৭
২৭. ঐ : পৃষ্ঠা : ৩৯
২৮. ঐ : পৃষ্ঠা : ৪২
২৯. ঐ : পৃষ্ঠা : ৭৬
৩০. ঐ : পৃষ্ঠা : ৪১
৩১. ঐ : পৃষ্ঠা : ৬৫
৩২. ঐ : পৃষ্ঠা : ৬৬
৩৩. ঐ : পৃষ্ঠা : ৬৬